রামতনু লাহিড়ী



ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স

তিন-আনা সংস্করণ "কল্পতরু" গ্রন্থাবলী নং ২৪

রামতনু লাহিড়ী

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime."

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ-প্রণীত

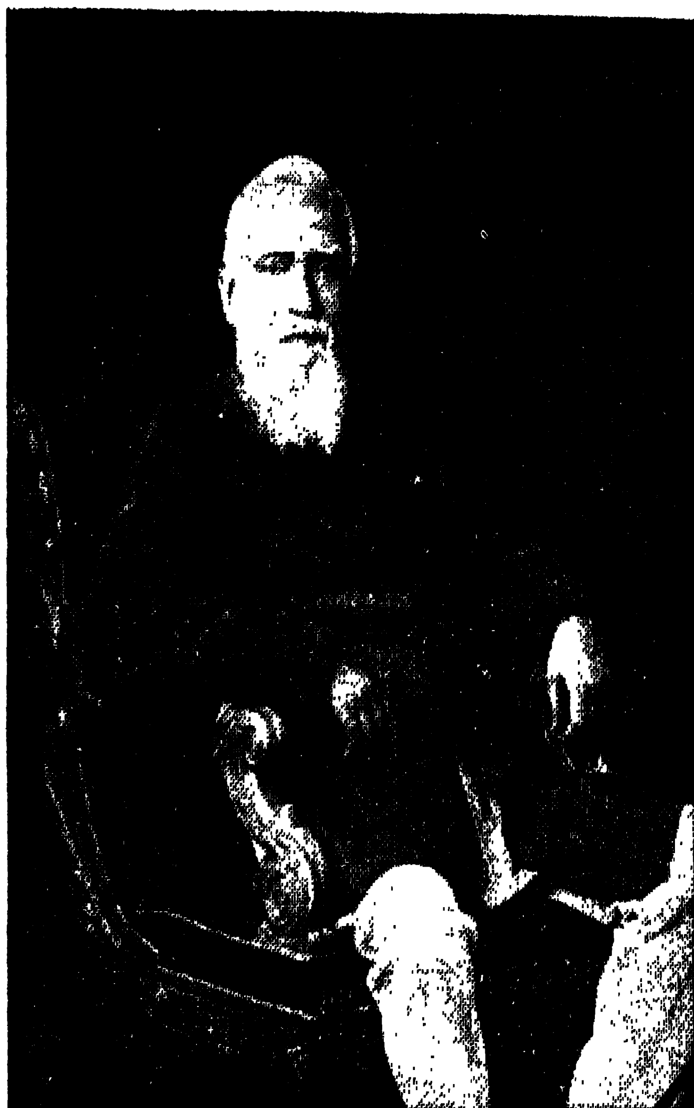
ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
ময়মনসিংহ, কলিকাতা ও ঢাকা

১৩২৮

মূল্য তিন আনা

কলিকাতা

৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং
১০৮ নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীকরুণাময় আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



রামতনু লাহিড়ী

এ জগতে মানুষের জীবন খুব অল্প। কমই হউক, আর বেশীই হউক, এমন কেহ নাই যিনি রোগ, শোক প্রভৃতি বিপদাপদ হইতে নিস্তার পাইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে নিরাশ হইবার কিছু কারণ নাই, কারণ কবি বলিয়াছেন :—

বলো না কাতরস্বরে
বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন।

দারা পুত্র পরিবার
তুমি কার কে তোমার
ব'লে জীব করো না ক্রন্দন।

মানব জনম সার
এমন পাবে না আর
বাহ্যদৃশ্যে ভুলোনারে মন।

কর কর্ম্ম হবে জয়
জীবন অনিত্য নয়

* * * *

সংসারে সংসারী সাজ
কর নিত্য নিজ কাজ
ভবের উন্নতি যাতে হয়।

এ জগতে কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকলেরই নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে এবং তাহা করিতে পারিলে সকলেই সংসার-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে। একমাত্র কর্ম্মের উপরই সমস্ত নির্ভর করে; হাজার শক্ত হইলেও যাহা কর্ত্তব্য, যাহা সৎকর্ম্ম তাহা যদি নির্ভয়ে করা যায়, তাহা হইলে অপর কোন গুণ না থাকিলেও মানুষ অমর হইতে পারে। বড় বড় লোকের জীবনী এই জন্যই লোকে আলোচনা করিয়া থাকে। তাঁহারা তাঁহাদের পিছনে যে মধুর স্মৃতি রাখিয়া যান, মানুষে তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের জন্য কাঁদিয়া থাকে। শুধু যে তাঁহাদের নাম লোকে স্মরণ করে তাহা নহে; তাঁহাদের জীবনের ইতিহাস পড়িয়া আরও দশজনে ধর্ম্ম এবং নীতি শিক্ষা পায়। সাধুলোকের জীবনী আলোচনা করিবার ইহাও একটি প্রধান কারণ। কি পুরাকাল, কি বর্ত্তমান কাল সকল সময়ের সকল জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। কত হাজার হাজার, শত শত বৎসর আগে রামচন্দ্র, বুদ্ধদেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জন্মিয়াছিলেন। তাঁহারা যে দেশে জন্মিয়াছিলেন, সেই অযোধ্যা, সেই কপিলাবস্তুর চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান নাই। কিন্তু তাঁহাদের নাম আজিও সকলে বিশেষ ভক্তির সহিত উল্লেখ করিয়া থাকে। রামচন্দ্রের অত্যদ্ভুত পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃভক্তি, প্রজাস্নেহ প্রভৃতি সকলে আদর্শ বলিয়া ধরিয়া থাকে। বুদ্ধদেবের "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই উপদেশের প্রভাব আজিও বর্ত্তমান আছে। তাঁহারা সাধারণ হিসাবে মৃত হইলেও তাঁহাদের অলৌকিক কর্ম্মবলে আজিও তাঁহারা অমর হইয়া আছেন, এবং তাঁহাদের জীবনের প্রভাব আজিও ধর্ম্ম এবং নীতি শিক্ষা দিতেছে।

আজ যে মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করিতেছি, তাঁহার দৈনিক কার্য্যাবলীর ভিতরেও এইরূপ প্রভাব বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক অর্থ রোজগার করিয়া অকাতরে ধন দান করিবার সুযোগ তাঁহার কখনও হয় নাই, সুতরাং তিনি দাতা বলিয়া বিখ্যাত

নহেন। তিনি বড় বড় উপাধিতে ভূষিত হয়েন নাই সুতরাং সে হিসাবে তাঁহার খ্যাতি নাই। দেশসংস্কারক, সমাজসংস্কারক, সুলেখক বা সুবক্তা প্রভৃতি নাম পাইবার জন্য কেহ কখন তাঁহাকে চেষ্টা করিতে দেখে নাই। তবে কিসের জন্য তাঁহার খ্যাতি এবং কি জন্যই বা তাঁহার জীবনী পাঠ করা আবশ্যক এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে। তাঁহার জীবনী পড়িলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সামান্য অবস্থায় থাকিলেও লোকে অনায়াসে কর্ম্মবীর হইতে পারে। সত্যবাদিতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুটিকতক সাধারণ গুণ আছে যাহা সকলেরই পালন করা উচিত এবং একমাত্র তাহার জোরেই মানুষ সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইতে পারে। এই সকল গুণের জন্য তাঁহার জীবন শুধু যে আলোচনা করিবার যোগ্য তাহা নহে, তাহা সকলের অনুকরণ করা উচিত।

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে, তিনি অর্থ ভালবাসিতেন না। সাধারণ গৃহস্থের খাওয়া পরার মতন টাকা উপায় হইলেই তিনি তাহা যথেষ্ট মনে করিতেন। তাঁহার সময়ে ইংরাজী শিক্ষা সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে, কাজেই সামান্য রকম ইংরাজী শিখিতে পারিলে লোকে অনায়াসে বড় চাকরী পাইত। সেকালের এবং একালের অবস্থার মধ্যে একটি পার্থক্য এইখানে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনকার চাকরীর বাজার কিরূপ তাহা অনেকেই অল্পই হউক বা অধিকই হউক, জানেন। এখন সকলকেই চাকরীর উমেদারী করিতে হয়; বড় চাকরী বা ছোট চাকরী, বড় লোক বা গরীবলোক বলিয়া কোন তফাৎ নাই। তখনকার কালে ইহার ঠিক বিপরীত অবস্থা ছিল, তখন চাকরীই লোকের উমেদারী করিত। রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ও ইচ্ছা করিলে এরূপ সুযোগে অনায়াসে বড় চাকরী করিয়া, বিলক্ষণ পয়সা রোজগার করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সেরূপ

প্রকৃতির লোক ছিলেন না। বিলাসিতা বা জাঁকজমক তিনি মোটেই ভাল বাসিতেন না। গবর্ণমেণ্টের অধীনে বা অপর কোন জায়গায় বড় চাকরী করিয়া পয়সা রোজগার দ্বারা দশজনের কাছে সুনাম কেনা তাঁহার ভাল লাগিল না। অনেকের কাছে হয়ত তাঁহার এই কাজ অদ্ভুত রকম লাগিতেছে। কিন্তু তিনি ভিতরে ভিতরে একজন বিশেষ দেশহিতৈষী লোক ছিলেন। তিনি দেখিলেন দেশে ইংরাজী শিক্ষার সবেমাত্র নূতন আমদানী হইয়াছে। দেশে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিও বিশেষ ভাল নহে। সুশিক্ষকেরও বিশেষ অভাব। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সুশিক্ষা দ্বারা বালকদিগকে উন্নত করিতে পারিলে দেশের যেরূপ উপকার হইবে, অপর কোনও কার্য্যের দ্বারা সেরূপ সম্ভব নহে। দেশের প্রকৃত উপকার করিতে হইলে ছোট ছোট শিশুগণকে সৎশিক্ষা দেওয়া বিশেষ দরকার, কারণ তাহাদের উপরই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। মহাপুরুষদিগের জীবনের সদুপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সুশিক্ষক ছাত্রগণের মনে যেরূপ উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিতে পারেন এবং ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে পারেন, তাহা অপর কোনও উপায়ে সম্ভব নহে।

এই লাহিড়ীবংশের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই সদাশয়তা, সত্যপ্রিয়তা, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণগুলি তাঁহাদের বংশের সকলেরই ছিল। তাঁহাদের বংশ বহুবিস্তৃত ছিল। কর্ম্মোপলক্ষে অনেকেই নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু যিনি যেখানে থাকুন, সদ্‌গুণ দ্বারা সকলেই লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন। এইরূপ বংশে জন্মিয়া যে লাহিড়ী মহাশয় লোকপূজ্য হইবেন ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের চৈত্র মাসে কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী বারুইহুদা নামক গ্রামে মাতুলালয়ে রামতনু বাবুর জন্ম হয়। যে সময় লাহিড়ী

মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন, সে সময় তাঁহার পিতা রামকৃষ্ণ দেশবিখ্যাত লালাবাবুদের জমিদারীতে কার্য্য করিয়া যৎসামান্য রোজগার করিতেন। তাঁহাদের যে কিছু পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি ছিল তাহা হইতেও কিছু কিছু আয় হইত। যদিও ইহাতে সংসারের সকল অভাব বেশ ভাল ভাবে পূরণ হইত না, তাহা হইলেও তিনি বড় ধার্ম্মিক লোক ছিলেন এবং সেই জন্য কখনও অন্যায়ভাবে এক পয়সাও রোজগার করিতে চেষ্টা করিতেন না। জমিদারীতে কাজ করিলে প্রায়ই অনেকে গরীব প্রজাদের নিকট হইতে দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারমাসে তের পার্ব্বণের বকশিস্ পাইয়া থাকেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ এইরূপে পয়সা লওয়া অন্যায় কার্য্য মনে করিতেন। শুধু যে তিনি নিজে লইতেন না তাহা নহে, কাহাকেও এইরূপ কার্য্য করিতে দেখিলে তিনি তৎক্ষণাৎ বাধা দিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এই সদয় ব্যবহারে প্রজারা এরূপ বশীভূত হইয়াছিল যে, কখন কোনও কারণে দরকার হইলে তাহারা প্রাণের সহিত যত্নে তাঁহার কাজ করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

সংসারে নানারূপ কষ্ট থাকিলেও তিনি নিজের ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। সকালে উঠিয়া প্রথমে স্নান করিয়া পরে পূজা করিতে বসিতেন। পূজা শেষ হইলে প্রথমে কোন গরীব, দুঃখী বা অতিথির সেবা করিয়া তবে তিনি নিজ হাতে রাঁধিয়া খাইতেন। আহারের পরও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ বা শাস্ত্রালোচনা করিয়া সময় কাটাইতেন। এই সকল দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি কিরূপ ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন।

রামতনুবাবুর মাতার নাম জগদ্ধাত্রী দেবী। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত রাজবাটীর দেওয়ান রাধাকান্ত রায় তাঁহার পিতা। রায় বংশের অনেকেই অনেক পূর্ব্ব হইতে রাজসরকারে কাজ করিতেছিলেন। সুতরা তাঁহারা সকলেই ধনী বলিয়া বিখ্যাত; কিন্তু বড় লোক হইলেও তাঁহারা বিশেষ ধার্ম্মিক ছিলেন।

জগদ্ধাত্রী দেবী বড়লোকের কন্যা, শৈশব হইতে চাকর, চাকরাণীর সেবা পাইয়াছেন কিন্তু তিনি শ্বশুরালয়ে গরীবানার মধ্যে থাকিতেই ভালবাসিতেন। সে সময়ে কৌলিন্য মর্য্যাদা খুব প্রচলিত ছিল। এখনও আছে বটে কিন্তু তত আর নাই। কৌলিন্য প্রথা অনুসারে জগদ্ধাত্রী দেবী ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বাপের বাটীর পরম সুখের মধ্যে থাকিতে পারিতেন। কিন্তু পাছে নিজ স্বামীর আত্ম-সন্মান আঘাত পায় এই জন্য তিনি স্বামীগৃহে থাকিতে ভাল বাসিতেন। তিনি নামে যেমন জগদ্ধাত্রী কাজেও সেইরূপ ছিলেন। বড় লোকের মেয়ে বলিয়া শাশুড়ী যদি কখন কোন কাজ করিতে বারণ করিতেন তাহা হইলে তিনি সে কথা শুনিতেন না। গৃহস্থালীর সামান্য সামান্য কাজগুলিও এমন সুন্দরভাবে করিতেন যে, অপর কেহ দেখিলে মনে করিত তিনি গরীবের মেয়ে, ছেলেবেলা হইতে করিয়া আসিতেছেন কাজেই তাঁহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। সংসারের সকল কাজকর্ম্ম করিয়া নিজ পুত্রকন্যা প্রভৃতি লালনপালন করিতে হইলেও কেহ কখন তাঁহাকে বিষণ্ন দেখিতে পাইত না। বরং কেহ যদি তাঁহাকে কাজ করিতে দেখিয়া দুঃখ করিত তাহা হইলে তিনি বিরক্ত হইতেন। একদিন তিনি ধান ভানিতেছেন এমন সময় তাঁহার পিতৃগৃহের একজন চাকরাণী তাঁহাকে দেখিতে আসিল। তিনি তাহাকে দেখিয়া কাজ হইতে বিরত না হইয়া তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে ধান ভানিতে লাগিলেন। দাসী তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করিলে তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আমার কোন কষ্টই নাই, মাকে বলিও আমি বেশ সুখে আছি।" এইরূপ রূপেগুণে সাক্ষাৎ লক্ষীরূপা এবং স্বামীগৌরবে গৌরবিনী মাতা এবং রামকৃষ্ণের ন্যায় পরম ধার্ম্মিক পিতার নিকট যাঁহার শৈশবশিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, সেই রামতনু যে পরে কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মনীতির আদর্শরূপে দশজনের বিশেষ পরিচিত হইবেন ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই।

রামকৃষ্ণের আটটী পুত্র এবং দুইটী কন্যা জন্মে। রামতনু বাবু তাঁহার পঞ্চম সন্তান। তাঁহার অগ্রে দুই ভ্রাতা ও দুই সহোদরা জন্মেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল মাত্র কেশবচন্দ্র নামে একটি ভ্রাতা এবং ভবসুন্দরী নামে একটি ভগিনী ব্যতীত অপর সকলে অল্পবয়সে মারা যান। কেশবচন্দ্র পরে বিশেষ যশস্বী পুরুষ হইয়া উঠেন। ইংরাজী এবং পারশী এই দুই ভাষা তিনি বেশ ভাল জানিতেন। প্রথমে কলিকাতায় কিছুদিন কেরাণী-গিরি করিবার পর, তিনি যশোহরে সেরেস্তা-দারি কাজের ভার পাইয়া সেইখানে বাস করেন। পিতা রামকৃষ্ণের ন্যায় তিনিও বিশেষ ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন তাহাই পিতামাতা এবং ভ্রাতাভগিনীদের পালনে ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট অর্থ দীন দুঃখীদের দান করিতে কখন কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি এরূপ পিতৃভক্ত ছিলেন যে, তাঁহার চিঠি পাইলেই আগে তাহা মাথার উপর রাখিয়া পরে তাহা পড়িতেন। এরূপ শুনা যায় যে তিনি দেবপূজার তাম্রকুণ্ডে জোর করিয়া মাতার পা রাখিয়া তাহা পূজা করিয়াছিলেন। যে মহাপুরুষ দেবতা অপেক্ষা মাতাকে অধিক ভক্তির চক্ষে দেখিয়া পূজা করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টান্ত ও সহবাস জনিত পুণ্যের প্রভাব যে কনিষ্ঠ রামতনুর জীবনেও সুস্পষ্ট রেখাপাত করিয়াছিল তাহা তাঁহার জীবনে বেশ দেখা যায়। যে মহাপুরুষ ভূমের্গরীয়সী মাতা এই সাধুবাক্যের অনুসরণ করিয়া মাতৃপূজা করিতে পারিয়াছেন তিনিই ধন্য!

পূর্ব্বে বলিয়াছি রামতনু বাবু পিতার পঞ্চম সন্তান। তাঁহার আর তিন সহোদর জন্মেন—তাঁহাদের নাম রাধাবিলাস, শ্রীপ্রসাদ এবং কালীচরণ। ইঁহাদের মধ্যে কালীচরণ মেডিকেল কলেজ হইতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনগরে ডাক্তারী করিতে আরম্ভ করেন। ইনিই পরে কৃষ্ণনগরে সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসক হইয়া উঠেন। দীনদরিদ্রের কাতরতা দর্শনে তাঁহার হৃদয় দয়ায় ভরিয়া উঠিত। এক

সময়ে তিনি কোন একটি দরিদ্র রোগীকে একখানি ব্যবস্থাপত্র দেন। তাঁহার ঔষধালয়ে ঐ ব্যক্তি তাঁহার স্বাক্ষরিত কাগজ লইয়া গেলে তাহাতে দেখা গেল ঔষধের নীচে "এক গাড়ি খর" লেখা আছে। ইহার মধ্যে যে কি রহস্য আছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "আমি উহার বাটী গিয়া দেখিলাম উহার ঘরের চাল খড়শূন্য। এরূপ অবস্থায় ঠাণ্ডা লাগিলে ঔষধে রোগীর কোন উপকার হইবে না, সেই জন্য এই ব্যবস্থা। এই সহৃদয়তা গুণে তিনি কৃষ্ণনগরের সকলের কাছে বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার গুণে লোকে এরূপ আকৃষ্ট ছিল যে, তিনি গৃহে পদার্পণ করিলেই রোগ নিশ্চয় সারিয়া যাইবে ইহা সকলের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। তাঁহার উল্লেখ করিয়া কবি বলিয়াছেন,—

"কোমল স্বভাব তাঁর মধুর বচন,
ছেলেরা আনন্দে নাচে পেলে দরশন,
ছেলেদের কালীবাবু, ছেলেরা কালীর
উভয়েতে মিশে যায় যেন ক্ষীরে নীর।"

তাঁহার ভ্রাতা রামতনু সম্বন্ধেও কবি বলিয়াছেন,—

পরম ধার্ম্মিকবর এক মহাশয়,
সত্যবিমণ্ডিত তাঁর কোমল হৃদয়।
একদিন তাঁর কাছে করিলে গমন,
দশদিন ভাল থাকে দুর্ব্বিনীত মন
বিদ্যাবিতরণে তিনি সদা হরষিত
তাঁর নাম রামতনু সকলে বিদিত।"

যাঁহার কাছে একদিন গেলে দশদিন মন ভাল থাকে সেরূপ লোক কি প্রকৃতই একজন মহাপুরুষ নহেন? প্রকৃত পক্ষে এ কথার সত্যতা কিছু থাকুক বা না থাকুক তাহাতে কি আসিয়া যায়; কিন্তু তিনি

যে বাস্তবিক লোকের অকৃত্রিম ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী এই জন্যই কবির কথায় বলা যায়—

"জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা রবে"

তাহার উপর রোগ, শোক প্রভৃতির হাত এড়াইতে পারিয়াছেন এরূপ লোক নাই বলিলেই হয়। কিন্তু দশজনের হৃদয়ের ভালবাসা পাওয়া কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? সেরূপ ভাগ্যবান্ কয়জন আছেন? লোকের উপর এই প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা মহাপুরুষের চিহ্ন। রামতনু বাবুর জীবনের মহত্ত্ব এইখানে।

কয়েকটী পুত্র কন্যার মৃত্যু হওয়াতে রামতনু কিছু অধিক মাত্রায় পিতামাতার আদর যত্ন লাভ করেন। ক্রমে রামতনু পাঁচ বৎসরের হইলে শাস্ত্র অনুযায়ী তাঁহার হাতে খড়ি হইল। স্বগ্রামে দেবীপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের পাঠশালায় তাঁহার লেখাপড়া আরম্ভ হইল। কিরূপ ভাবে তাঁহাব বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইল তাহা একবার আলোচনা করা দরকার।

তখনকার প্রথা এবং এখনকার প্রথা এই দুয়ের অনেক প্রভেদ দেখা যায়। প্রথমতঃ আজকাল যেমন বড় বড় বাড়ী, তাহার মধ্যে বড় বড় ঘর, চেয়ার টেবিল এবং ছাত্রদের বসিবার জন্য বেঞ্চ থাকে তখন সেরূপ কিছু ছিল না। হয়ত বা কাহারও বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে, না হয় কোন বড় গাছের তলায় গুরুমহাশয় তাঁহার শিষ্যদের পড়াইতেন। সেকালের গুরু-মহাশয়ের রুদ্রমূর্ত্তি এবং হাতের বেত দেখিলে রাস্তা হইতে ছেলেদের মুখ ভয়ে শুকাইয়া যাইত। তাহাদের বসিবার জন্য মাদুর পাতা থাকিত, তাহাতে বসিয়া সকলে নিজ নিজ পড়া আরম্ভ করিত। ছোট ছোট ছেলেরা তালপাতায় কঞ্চি বা সরের কলমে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তাক্ষর, মোটামুটী চিঠিপত্র এবং হিসাব লিখিত। অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেরা প্রায়ই ছোট

ছেলেদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিত। মোটামুটীহিসাবে লিখিতে, পড়িতে এবং হিসাব শিখিতে পারিলে পাঠশালার পড়া শেষ হইত। তাহার পরে যে যেমন ইচ্ছা পড়া চালাইত। ব্রাহ্মণদের ছেলেরা তখন টোলে সংস্কৃত পড়িত। আজকাল যেমন ইংরাজী, রাজার জাতির ভাষা বলিয়া আদর পাইতেছে, তখনও পারস্য ভাষার ঐরূপ আদর ছিল। কাজেই যাহারা পরে রাজসরকারে বড় কাজকর্ম্ম যোগাড় করিবার ইচ্ছা করিত তাহারা অনেকেই পারসী পড়িত।

তখনকার কালে গুরুমহাশয়কে কোন নির্দ্দিষ্ট বেতন দিতে হইত না। যাহার যেরূপ অবস্থা গুরুমহাশয় তাহার নিকট হইতে সেইরূপ লইতেন। কিন্তু তাঁহার কোন পূজা বা পার্ব্বণী বাদ যাইত না। প্রত্যেক সময়েই গুরুমহাশয়ের কিছু কিছু দক্ষিণা ছেলেদের নিকট হইতে আদায় হইত। তাহা ছাড়া তাঁহার উপরি পাওনাও বেশ ছিল। সকলেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শাক সবজী, ফল মূল, তামাক প্রভৃতি পিতামাতার অজ্ঞাতসারে লইয়া আসিত। তাহাদের গুরুভক্তি এরূপ প্রবল ছিল যে, পিতামাতাকে লুকাইয়া আনিতে তাহারা কখনও কুণ্ঠিত হইত না। কাহারও আসিতে দেরী হইলে সে বুদ্ধি করিয়া গুরুমহাশয়কে কিছু উপরী আনিয়া দিত, তিনিও মহা সন্তুষ্ট হইতেন। যে আনিতে পারিত না তাহার সেইদিন প্রত্যেক বিষয়েই গুরুমহাশয় ভুল দেখিতে পাইতেন এবং তাহা সংশোধনের জন্য বেত্রাঘাত করিতেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই বদলাইয়া যায়। আজকাল স্বাধীনতার দিন। সকলেই সমান পংক্তির ব্যবহার চায়। তখনকার কালে গুরু ভাবিতেন আমি শিক্ষক কাজেই বেত্রাঘাত করিতে হইবে, ছাত্রেরা ভাবিত গুরুমহাশয় গুরুজন কাজেই তাঁহার প্রহার সহ্য করিতে হইবে। আজকাল ছেলেরা মনে করে উভয়ের মধ্যে সমান সম্পর্ক, তিনিও মানুষ, আমরাও মানুষ, তিনি মাহিনা পাইতেছেন, আমরা সকলে দিতেছি, কাজেই তাহারা

সমান সমান ব্যবহার চায়। প্রহারের ব্যবস্থা ত এখন নাইই। অনেক সময় বিপরীত ব্যবস্থাও হয়। ছাত্রেরা এখন শিক্ষকের দোষ দেখিলে তাঁহাকে বয়কট করে, অনেকে আবার ক্ষমা চায়, দু এক জায়গায় প্রহার দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তখন অসভ্যতার দিনে শিষ্য প্রহার খাইত, এখন পুরা সভ্যতা, গুরু শিষ্যের সহিত ভয়ে ভয়ে কথা কহেন, সর্ব্বদাই শঙ্কিত পাছে কোন দোষের কথা বলিয়া ফেলেন।

সে যাহাই হউক, মোটামুটী দেখিতে গেলে পূর্ব্বেকার পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে খুব কম হইত একথা অস্বীকার করা যায় না। দুই এক বিষয়ে যে তাহা খারাপ ছিল তাহাও বলিতে হইবে। তাহার পরিবর্ত্তনে আজকাল অনেক ভাল হইলেও তাহা যে একেবারে সকল গুণশূন্য ইহা বলিলে নিতান্ত অন্যায় হয়।

রামতনুর এই পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষা আরম্ভ হইল। বেত্রাঘাতের ভয়ে তিনিও অন্যান্য ছেলেদের মত অনেক সময় পাঠশালা হইতে পলাইয়া যাইতেন বটে, কিন্তু কখনও পাঠে অমনোযোগী ছিলেন না। শেষ বয়সে লাহিড়ী মহাশয় নিজে অনেককে বলিতেন যে, তাঁহার এই পলায়ন ব্যাপারে রামকৃষ্ণ বড় মনঃকষ্ট পাইতেন। তাঁহার একজন সহপাঠী চুরি বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। তাহার সঙ্গে থাকিয়া তিনিও উহা শিখেন। রামকৃষ্ণ দেখিলেন এইরূপ সংসর্গে কখনই প্রকৃত শিক্ষা হওয়া সম্ভব নয়। তিনি পুত্রের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কেশবচন্দ্র এই সময়ে আলীপুরে কাজ করিতেন। পিতামাতা উভয়কে উৎসুক দেখিয়া কেশবচন্দ্র রামতনুকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন।

চেতলার বাসায় আসিয়া রামতনু অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের আয় সামান্য এবং নিজ বাসার খরচ কুলাইয়া এবং পিতামাতার সাহায্যের জন্য কিছু কিছু পাঠাইয়া কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না। সেইজন্য তাঁহাকে দু'একটা উপরি কাজ করিতে হইত। তাহা করিয়াও যে সময়

পাইতেন তাহা ভ্রাতার শিক্ষা কার্য্যে কাটাইতেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন এরূপে ভালরূপ উন্নতি হইবে না। তাহা ছাড়া সে সময় ইংরাজী শিক্ষা নূতন আরম্ভ হইতেছে। তিনি দেখিলেন একটু ভাল করিয়া ইংরাজী শিখিতে পারিলে বিশেষ সুবিধা, সুতরাং রামতনুকে ভাল করিয়া ইংরাজী শিখাইবার ইচ্ছা তাঁহার প্রবল হইল।

তৎকালে দেশমান্য হেয়ার সাহেবের স্কুল ব্যতীত ইংরেজী শিখিবার অপর কোনও বিদ্যালয় ছিল না। সদাশয় হেয়ার সাহেব একজন ইউরোপ-বাসী হইলেও তিনি অত্যন্ত উদারচেতা লোক ছিলেন। তিনি ভারতকে নিজের দেশের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। কিসে এদেশের উন্নতি হইবে, কিসে এদেশ বাসীরা বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিবে ইহার উপায় উদ্ভাবনে সারা জীবন অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি একজন ঘড়ি ব্যবসায়ী ছিলেন। নিজে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিলেও এদেশের উপকারের জন্য তাহার সমস্তই দান করিয়া পরে নিজে একটি বন্ধুর বাটীতে থাকিতেন। তাঁহার ন্যায় উদারচেতা লোক জগতে বিরল। একমাত্র তাঁহারই চেষ্টায় সেই সময়ে ইংরাজী শিখাইবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। শুধু যে ছেলেরা বিনা বেতনে পড়িতে পাইত তাহা নহে অনেকে আবার আবশ্যক মত পুস্তকাদিও পাইত। কেশবচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতাকে এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকায় তিনি অনেক চেষ্টাতেও কৃতকার্য্য হইতে না পারায় চিন্তিত হইলেন।

কেশবচন্দ্র ভ্রাতাকে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিবার জন্য চিন্তিত, ঠিক সেই সময়ে কালীশঙ্কর মৈত্র নামে একব্যক্তি কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহার নিকট সহায়তার জন্য আসেন। তাঁহার এক আত্মীয় হেয়ার সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে সহায্য করিবেন স্বীকার করিলেন কিন্তু কথা থাকিল যে প্রতিদানস্বরূপ রামতনুকে হেয়ার স্কুলে

ভর্ত্তি করাইয়া দিতে হইবে। কালীশঙ্কর আত্মীয়ের দ্বারা রামতনুকে ভর্ত্তি করিয়া দিবার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সে সময় ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইত না। নির্দ্দিষ্টসংখ্যক অবৈতনিক ছাত্র ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছিল বলিয়া হেয়ার সাহেব নূতন ছাত্র লইতে চাহিলেন না।

হেয়ার সাহেব নূতন ছাত্র ভর্ত্তি করিতে রাজী নহেন কিন্তু তাঁহার মত সদাশয় লোককে ছেলেরা ছাড়িবে কেন? হেয়ার পাল্কী করিয়া বাটীর বাহির হইলে বালকগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত এবং কেহ কেহ me poor boy, have pity on me, take me in your school বলিত। পরামর্শানুসারে রামতনুকেও এই মহাজন পন্থা অবলম্বন করিতে হইল। এইরূপে প্রায় দুই মাস রামতনু ছুটাছুটী করিলেন। ইহা তাঁহার অদম্য অধ্যবসায়ের পরিচয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার লেখা পড়া শিখিবার কেমন এক গভীর ইচ্ছা ছিল। তাহা না হইলে কি কেহ পরের কথায় আহারনিদ্রা ছাড়িয়া এত কষ্ট করিতে পারে। তাঁহার আগ্রহাতিশয্য দর্শনে হেয়ার সাহেব তাঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। সেই সঙ্গে আর একটি ছাত্রও প্রবেশ লাভ করিল। পরবর্ত্তীকালে ইনিই রাজা দিগম্বর মিত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

স্কুলে ভর্ত্তি হইবার পর কেশবচন্দ্র দেখিলেন আরও এক মুস্কিল উপস্থিত। রামতনু, কালীশঙ্কর বাবুর আত্মীয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া পড়িতেছিলেন। সেখানে তাঁহাকে রন্ধন এবং অন্যান্য দু'একটি কাজও করিতে হইত। তদুপরি বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের চরিত্রও ভাল ছিল না। রামতনুর পড়াশুনার ব্যাঘাত দেখিয়া কেশবচন্দ্র তাঁহাকে স্বীয় পিতার মাতুলপুত্র রামকান্ত খাঁ মহাশয়ের শ্যামপুকুরস্থিত বাসায় রাখিয়া আসিলেন। খাঁ মহাশয়ের গৃহিণী রামতনুকে পুত্রনির্ব্বিশেষে ভাল বাসিতেন। তাহা ছাড়া এখানে দিগম্বর মিত্র ও ক্রমে তাঁহার মাতার

সহিত রামতনুর পরিচয় হয়। দিগম্বরের মাতা তাঁহাকে নিজ পুত্রের মত আদর যত্ন করিতেন। এই সস্নেহ ব্যবহার রামতনু ইহ জীবনে কখনও ভুলিতে পারেন নাই, বৃদ্ধ বয়সেও তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেন।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রামতনু হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে আসিলেন। তখন নিয়ম ছিল, অগ্রগণ্য ছাত্রেরা হেয়ার স্থাপিত স্কুল সোসাইটীর স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে পড়িবে। দরিদ্র ছাত্রদের বেতনও স্কুল সোসাইটী দিতেন। রামতনু অবৈতনিক ছাত্র হইলেন, দিগম্বর মিত্রও তাঁহার সহিত ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। কলেজে যে সকল সহাধ্যায়ীর সহিত রামতনু মিলিত হইলেন তাঁহাদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ পরে বিশেষ খ্যাতনামা হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া দেশের আরও অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি তখন অসাধারণ প্রতিভাবান্ এবং বঙ্গের নব যুগের প্রবর্ত্তক ডিরোজিও সাহেবের শিষ্য ছিলেন।

ক্রমে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলে রামতনু তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ঠাকুরদাস লাহিড়ীর পাথুরিয়াঘাটার বাসায় আসেন। প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষায় রামতনু ১৬৲ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়া তাঁহার অপর দুই ভ্রাতাকেও কলিকাতায় লইয়া আসেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রামতনু পাঠ শেষ করিয়া ৩৩৲ টাকা বেতনের এক শিক্ষকতা গ্রহণ করিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোন একটা বড় চাকরী অনায়াসে লাভ করিতে পারিতেন। কারণ আজ কালকার মত তাহা এত কষ্টসাধ্য ছিল না। কিন্তু তিনি অর্থ ভালবাসিতেন না। দেশে সুশিক্ষকের অভাব দেখিয়া শিক্ষকতা কার্য্যে জীবন যাপন করাই স্থির করিলেন। মাসিক তেত্রিশ টাকার ভরসাতেই তিন ভ্রাতা কলিকাতায় থাকিতেন। কেবল তাহাই নহে, এই কর্ম্ম পাইবা মাত্র তাঁহার বাসা নিরাশ্রয় ও আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তিগণের আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিল। আপনাদের খরচ বাদে যাহা বেশী থাকিত তাহা পিতামাতাকে পাঠাইতেন।

তাহা ছাড়া দুঃখী লোকদিগকে দান করিবার জন্য মাঝে মাঝে কিছু খরচ করিতেন।

হেয়ার সাহেবের স্কুলে ইংরাজী পড়াইবার জন্য যে সকল শিক্ষক ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ডিরোজিওকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত। একে তিনি একজন ইংরাজ যুবক, তাহার উপর আবার ফরাসী বিপ্লবে সাম্য, মৈত্রী ভাবপূর্ণ পুস্তকও অনেক পড়িয়াছিলেন। কাজেই তিনি একজন বিশেষ স্বাধীনতাপ্রিয় লোক হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়মের অধীন হইয়া থাকা তিনি নিজে পছন্দ করিতেন না এবং ছেলেদেরও তাহা শিখাইতেন না। তিনি প্রায় ছেলেদের বলিতেন "যখন কোন কাজ করিতে হইবে, তাহা আগে নিজে নিজে বিচার করিয়া তবে করা উচিত। ইহা অনেকদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে তাহা করিতে হইবে তাহার কোন মানে নাই। আমার পক্ষে তাহা ঠিক কি না, যথার্থই তাহা ভাল কি না, তাহা দেখিয়া তবে করা আবশ্যক।"

তাঁহার এই উপদেশের ফলে বাঙ্গলায় যেন এক নূতন যুগ আসিল। ইংরাজী শিক্ষা এবং ডিরোজিওর উপদেশে মাতিয়া উঠিয়া বিদ্যালয়ের ছেলেরা সকলেই নিজ নিজ সমাজের আচার ব্যবহারের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই বিদ্রোহের সূচনা হইতেই বাঙ্গালার নূতন যুগের আরম্ভ বলিয়া ধরা হয়।

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ দেখিতে পাইলেন, সামাজিক আচার ব্যবহার প্রভৃতির যে ধরাবাঁধা নিয়ম আছে, তাহাতে স্বাধীনভাবে কাজ করিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা। তখন তাঁহারা দেখিলেন এ সকল বাঁধাবাঁধি বদলান দরকার। তাঁহারা ধূয়া ধরিলেন "একটা নূতন কিছু করিতে হইবে; আগে হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া যে তাহা মানিতে হইবে সে দিন আর নাই।" এই নূতন কিছু করার মধ্যে যে সকল মহাত্মাদের নাম দেখা যায় তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায়ের

নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। এক পক্ষে দেখিতে গেলে তিনিই এই বিদ্রোহের প্রধান নেতা। কিন্তু তাঁহার সহিত অপর সকলের তুলনা করিলে একটু প্রভেদ দেখা যায়; তাহা এই যে নূতন কিছু করিতে গিয়া তিনি পুরাতনকে একেবারে অশ্রদ্ধা করেন নাই। তিনি হিন্দুদের জাতীয় পদ্ধতির যে ভিতরকার একটা মহত্ত্ব তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন বটে, যদিও শিক্ষকের নিকট প্রাপ্ত স্বাধীনতাবৃত্তির ভাব তিনি ছাড়িতে পারেন নাই। ছোটই হউক আর বড়ই হউক যে কোন একটা সামাজিক বিপ্লব হইলেই তাহার ফলে এক গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। প্রাচীন লোকগণ দেখিলেন যে ছেলেরা কিছু বেশী মাত্রায় নূতন ভাবের পক্ষপাতী হইয়াছে। তাঁহারা তাহা ভাল নয় বিবেচনা করিয়া ছেলেদের বাধা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাধা পাওয়াতে ছেলেদের উৎসাহ যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। তাহাদের মনে দৃঢ় ধারণা হইল যাহা কিছু পুরাতন তাহাই মন্দ, যাহা নূতন তাহাই ভাল। সকল প্রকার কুসংস্কার, প্রচলিত পূজাপদ্ধতি এবং অপরাপর প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া নিজ ইচ্ছা মত কার্য্য করিতে লাগিলেন। সমাজে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। ইহার ফল ভাল হইল কি মন্দ হইল তাহা বলিবার আবশ্যকতা নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা উচিত যে, তাঁহারা নূতন কিছু করিবার উৎসাহে একেবারে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। দেশ কাল এবং পাত্র ভেদে যে অবস্থাভেদ হয় ইহা তাঁহারা বিবেচনা করিবার সময় পাইলেন না।

একেত ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে দেশের শিক্ষিত যুবকদের মনের অবস্থা এইরূপ, তাহার উপর আবার সেই সময় লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ভারতবর্ষের বড়লাট হইয়া আসিলেন। বেন্টিঙ্ক বাহাদুর কিরূপ ভারতবাসীর প্রিয় ছিলেন তাহা ইতিহাসপাঠক মাত্রেরই জানা আছে। সেই সময় কতকগুলি প্রথা সমাজে চলিত ছিল, যথা—সহমরণ প্রথা

অর্থাৎ কোন লোক মরিলে তাহার স্ত্রী স্বামীর সহিত এক চিতায় আরোহণ করিয়া পুড়িয়া মরিত, অনেকে অপুত্রক অবস্থায় গঙ্গাদেবীর নিকট পুত্রকামনা করিয়া মানস করিত যে, তাহার প্রথম সন্তান হইলে তাহাকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিবে। বেন্টিঙ্ক বাহাদুর এই সকল প্রথা রোধ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। একদিকে রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সমাজসংস্কারের চেষ্টা এবং তাহার ফলে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপন, অপরদিকে বেন্টিঙ্কের সহমরণ প্রভৃতি কুপ্রথা আইনের সাহায্যে উঠাইয়া দিবার চেষ্টা; যেন মণি-কাঞ্চন সংযোগ হইল। বিধাতা যেন ইচ্ছা করিয়াই একই সময়ে দুয়ের আয়োজন করিলেন।

এই সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত বুঝিয়া রামমোহন রায় ব্রহ্ম উপাসনার মন্দির স্থাপনা করিলেন। রামতনু লাহিড়ী এবং তাঁহার সহপাঠী অনেকে তাহাতে বিশেষ আনন্দের সহিত যোগদান করিয়া রামমোহনকে বিশেষ উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মন্দিরে প্রায়ই সভা হইত। সেই সভায় দেশের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ের আন্দোলন করা সকলের এক প্রকার কার্য্য হইয়া উঠিল। পূজা-পদ্ধতি, উপবীতধারণ প্রভৃতিকে কুসংস্কারের অন্ধবিশ্বাস বলিয়া ধারণা এবং প্রতিমাপূজা প্রভৃতির সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিতে দেখিয়া সমাজের গোঁড়া লোকগণ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। সুরাপান ব্যাপারও তাঁহাদের মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে ঢুকিয়াছিল। প্রবীণ লোকগণ সকলেই ভাবিতে লাগিলেন ইংরাজী শিক্ষা পাওয়াতে ছেলেরা এইরূপ মাতিয়া উঠিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষকদের মধ্যে ডিরোজিও সাহেবকে সকলে দোষী করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে ডিরোজিও সাহেব ছেলেদের মনে এই বিদ্রোহের ভাব প্রবেশ করাইয়াছেন। হিন্দু কলেজ কমিটীর সভ্যগণ একটি সভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় দেব-পূজা, পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রভৃতির বিরোধী হইবার জন্য শিক্ষা

দিয়াছেন এই দোষ দেখাইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করাইলেন। ডিরোজিও সাহেব প্রকৃতপক্ষে দোষী কিনা ইহা তাঁহারা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলেন না। ডিরোজিও সাহেব এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার এক সাহেব বন্ধুকে একখানি পত্র দেন। তিনি তাহাতে লিখিয়াছিলেন "পিতা-মাতাকে অভক্তি করিতে শিখান দূরে থাকুক, আমি তাহাদিগকে বরাবরই পিতামাতাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে শিখাইয়াছি। আমি কেবলমাত্র তাহাদের বলিয়াছি, যে কাজ করিতে হইবে তাহা কখন সংস্কারবশে করা উচিত নহে; ভাল মন্দ বিচার করিয়া তবে করা উচিত। একটি ছাত্র এক সময়ে তাহার পিতার নিকট তিরস্কার এবং মার খাইয়া বাটী হইতে পলাইয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়া আমার কাছে পরামর্শের জন্য আসিয়াছিল। তাহাকে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক, আমি তাহাকে তজ্জন্য তিরস্কার করিয়া বলিয়া দিলাম যে, সে যদি বাটী ফিরিয়া না যায় তাহা হইলে আমি তাহাকে কোনরূপ পরামর্শ দিতে পারি না।" সে যাহা হউক, ডিরোজিও পদচ্যুত হইলেন। কিন্তু সভ্যগণ যে আশা করিয়াছিলেন তাহা হইল না। তিনি ছেলেদের মনে যে বিদ্রোহের ভাব বপন করিয়াছিলেন তাহা তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে চালাইতে লাগিলেন।

রামতনু বাবুর হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা গ্রহণের দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা উপস্থিত হইল। কোন্ ভাষায় শিক্ষাপ্রচারের ব্যবস্থা করিলে দেশের কল্যাণ হইবে ইহা লইয়া এক তর্ক উপস্থিত হইল। কেহ বলিতে লাগিলেন ইংরাজী ভাষার প্রচলন হওয়া দরকার, আবার যাঁহারা পুরাতন মতের পক্ষাবলম্বী তাঁহারা বলিলেন বাঙ্গালী বালকদিগের শিক্ষার জন্য বাঙ্গালা ভাষার সাহায্য লওয়া দরকার। কিন্তু তখন ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের জন্য কলেজের ছাত্রদল এবং তাহাদের দলের সকলে "ইংরাজী শিক্ষা চাই" বলিয়া রব তুলিলেন। উভয় পক্ষ-

হইতেই আবেদনপত্র গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান হইল। মেকলে নামে বিশেষ জ্ঞানবান্ একজন সাহেব সেই সময়ে বড়লাট সভার সভ্য ছিলেন। তিনি অনেক যুক্তিতর্ক করিয়া দেখাইলেন যে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা প্রচলন উচিত নহে। সমাজে প্রচলিত কু-অভ্যাস এবং কুরীতি ইংরাজী ভাষার সাহায্যে দূর করা সম্ভব। বাঙ্গালা ভ যায় তাহা হইবে না। বড়লাট বেণ্টিঙ্ক সাহেবেরও সমাজ সংস্কার করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। তিনি মেকলে সাহেবের সঙ্গে একমত হইয়া প্রচার করিলেন যে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়াই আবশ্যক এবং গবর্ণমেণ্টের অর্থ ইংরাজী ভাষার শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইবে। নূতন দলের লোকগণ এই ব্যাপারে মহাসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন "মেকলে সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক। এক আলমারী ইংরাজী বই পড়িলে যে জ্ঞানলাভ হওয়া সম্ভব, বাঙ্গলার সমস্ত সাহিত্য পড়িলেও তাহা হইতে পারে না।" এই মতের সহিত একমত হইতে না পারিলেও ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে আমাদের দেশের অনেক উন্নতি হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতির নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। যদি ইংরাজী ভাষা না থাকিত তাহা হইলে তাঁহাদের যে সকল উপন্যাস বা কবিতায় বাঙ্গালা সাহিত্যের এত উন্নতি হইয়াছে তাহাও হইত না। ইংরাজী শিক্ষিত ছাত্রদল এবং মেকলের মতাবলম্বী লোকদিগের দোষ দেখা যায় না, তাঁহারা যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন সেইরূপই করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে কলিকাতায় দুই একটি করিয়া কলেজ স্থাপিত হইতে লাগিল।

এই সূত্রে কৃষ্ণনগরেও একটি কলেজ খোলা হইলে লাহিড়ী মহাশয় সেখানকার দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ পাইয়া কৃষ্ণনগরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বন্ধুগণ সকলেই লাহিড়ী মহাশয় আসিতেছেন শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং পরম সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

বাল্যকালের পুরাতন কাহিনী স্মরণ করিয়া তাঁহারা লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত কিছুক্ষণ অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দলাদলি তখন সকল জায়গায় অল্প বা অধিক পরিমাণে চলিতেছিল। লাহিড়ী মহাশয়ের আসার পর হইতে কৃষ্ণনগরেও তাহা আরম্ভ হইল। কিন্তু রামতনু বাবু কোন দলাদলি ভালবাসিতেন না। তিনি প্রায়ই তাঁহার বন্ধুদের বলিতেন "তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাল বাস ব্রাহ্মের মত থাক, অপরের সহিত দলাদলি করিও না। যাহা তুমি ভাল বোঝ কর, অপরে যাহা ভাল বোঝে করুক। দলাদলি করিলে অপরের সহিত ঝগড়া বা বকাবকি ছাড়া ত আর কিছু লাভ নাই।" তিনি বরাবর এই মত অনুযায়ী কাজ করিয়াছেন। কখনও তিনি অপর সম্প্রদায় বা লোকবিশেষের বিরুদ্ধে মত বা অমত প্রকাশ করেন নাই। এই ন্যায়পরতার জন্য সকল দলের লোকই তাঁহাকে সমানভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। হেয়ার সাহেব এবং ডিরোজিওর নিকট তিনি যে শিক্ষা এবং উপদেশ পাইয়াছিলেন, কৃষ্ণনগরে আসিয়া তিনি তাহা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বন্ধুগণও ডিরোজিওর নিকট হইতে প্রাপ্ত যুক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন কৃষ্ণনগরে সমাজের গোঁড়ামী বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান। তাঁহারাও তাহা ভাঙ্গিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে কুরীতির পরিবর্ত্তে যাহা ন্যায়সঙ্গত তাহা প্রচার করিতে হইবে। কিন্তু কার্য্যগতিকে তাঁহারা যেন একেবারে সমাজবন্ধন ভাঙ্গিয়া দিবার জোগাড় করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও, তাঁহাদের আন্দোলন করিতে দেখিয়া সমাজের নেতারা তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলেন না।

তাঁহারা রামতনুপ্রমুখ নব্যতন্ত্রের লোকদিগের উপর চটিয়া উঠিয়া অনিষ্টসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। এক সুযোগও উপস্থিত

হইল। একটি সভায় আহূত হইয়া কলিকাতা হইতে কালীকৃষ্ণ মিত্র কৃষ্ণনগরে আসেন। তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য একটি বনভোজনে ছাগ-হত্যা করা হয়। কুচক্রীরা প্রচার করিয়া দিলেন যে বনভোজনে গোহত্যা করা হইয়াছে। অপর একজন বলিল সে মৃত গোবৎস বৃক্ষে লম্বমান দেখিয়াছে। ইহা ক্রমে লোকমুখে নানাভাবে ছড়াইয়া পড়ায় এক গোলযোগ উপস্থিত হইল। এই সকল ব্যাপারের সহিত অল্পাধিক পরিমাণে সংশ্লিষ্ট থাকায় রামতনু দেখিলেন কৃষ্ণনগরে থাকা তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক নহে। একে ত পিতার মনঃকষ্ট, তদুপরি সামাজিক নির্য্যাতনও যে হয় নাই তাহা বলা যায় না। তিনি চেষ্টা করিয়া ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে হেডমাষ্টারের পদে বদলী হইলেন।

কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে লাহিড়ী মহাশয়কে দুইটী শোক পাইতে হইয়াছিল। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে তাঁহার শিক্ষাগুরু হেয়ার সাহেব ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করায় তিনি হৃদয়ে বিশেষ আঘাত পাইলেন। ছাত্ররূপে কলিকাতায় অবস্থানকালে রামতনু পীড়িত হইলে হেয়ার সাহেব পুত্রাধিক সেবা করিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, সুখ, সমৃদ্ধি সকল বিষয়েই রামতনু হেয়ার সাহেবের নিকট ঋণী ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে হেয়ার সাহেবের কথা মনে হইলে অনেক সময় তাঁহার হৃদয় কাতর হইয়া উঠিত।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেশবচন্দ্র এই সময়ে পরলোক গমন করিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে রামতনু বাবু যে গভীর শোক পাইলেন তাহা আর কথায় বলিবার নহে। তদুপরি আবার কিছু দিনের মধ্যেই জগদ্ধাত্রী দেবী পীড়িত হইলেন। রামতনু যেন চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। দিবারাত্রি আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণে সেবা করিলেও, সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল। কালের কুটীল গতি রোধ করা কাহার সাধ্য? যে

মাতাকে দুইভ্রাতায় দেবতার অধিক জ্ঞানে পূজা করিতেন, তাঁহার মৃত্যুতে রামতনু স্পন্দহীন হইয়া কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলেন। কিন্তু শোকের বেগ চিরকাল থাকে না। ক্রমশঃ তাহা কমিয়া গেল বটে কিন্তু তাহা বাহিরে। ভিতরে ভিতরে তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিনই তাঁহাদের কথা মনে হইলে নীরবে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেন।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে কৃষ্ণনগরে বাস বিশেষ ক্লেশকর বোধ হওয়াতে রামতনু চেষ্টা করিয়া বর্দ্ধমানে বদলী হইলেন। কিন্তু সুগন্ধ পুষ্প যেমন যেখানেই থাকুক না কেন সুগন্ধ বিস্তারে সকলকে আমোদিত করিয়া থাকে, লাহিড়ী মহাশয়ও বর্দ্ধমানে তাঁহার স্বাভাবিক সরলতা এবং সৌজন্যগুণে সকলকে মুগ্ধ করিলেন। একটি ঘটনা হইতে এই ব্যাপার বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমানে তিনি গমন করিবার পর বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর অনেক ছাত্র কিরূপ নূতন শিক্ষক আসিয়াছেন তাহা দেখিতে আসিল। আগেকার পাঠশালা এবং বিদ্যালয়সমূহে গুরু মহাশয়গণ ছেলেদের মনে কিরূপ ভয়সঞ্চার করিতেন তাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। বর্দ্ধমানেও শিক্ষক মহাশয়গণ ছাত্রদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের দু একজনকে ছেলেরা এরূপ ভয় করিত যে, তাঁহাদের দেখিতে পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ চুপ করিয়া এক কোণে বসিয়া থাকিত। শিশুদের মুখের সে সুন্দর হাসি, যাহা দেখিলে স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করা যায়, তাহা যেন কোথায় চলিয়া যাইত। রামতনু বাবু প্রথম দিন আসিয়া আফিসঘরে কাজ কর্ম্ম দেখিতেছেন। ছেলেরা সকলে দলে দলে ভিড় করিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিল। সকলেই দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিল; কিন্তু তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া একটী বালক তাঁহার চাপকান ধরিয়া একটু টানিল। তিনি বালকটীর দিকে চাহিয়া কেবলমাত্র একটু হাসিলেন। বালক বাটী যাইয়া গল্প করিল "এবার একজন মুসলমান হেডমাষ্টার আসিয়াছেন।" বালকের পিতা বলিলেন "কই তাহাত শুনি নাই।" বালক বলিল "পূর্ব্বে যাঁহারা

আসিয়াছেন আমি কখনও তাঁহাদের কাছেও যাইতে পারি নাই। আজ আমি নূতন মাষ্টার মহাশয়ের কাপড় ধরিয়া টানাতে তিনি কেবল একটু হাসিলেন, কিছুই বলিলেন না।" বলা বাহুল্য, বালকের ধারণা ছিল যে হিন্দু শিক্ষক কখনও এরূপ ব্যবহার করিতে পারেন না। কঠোর শাসনই শিক্ষকের চিহ্নস্বরূপ বলিয়া বালকের ধারণা ছিল। বালকের পিতা তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, শিক্ষিত হইলেই লোকের ক্ষুদ্রত্ব চলিয়া যায়। তিনি তখন সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন। ভয়ে ভক্তি অপেক্ষা ভালবাসার ভক্তিই এই বালককে আজীবন লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট শ্রদ্ধাবান্ করিয়া রাখিয়াছিল।

একদিন গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলায় লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার পাল্কীর বাহকদিগকে দেখিতে না পাইয়া বিদ্যালয়ের ছুটীর পর দাঁড়াইয়া আছেন। কয়েকজন ছাত্র বাহকদিগের সন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পাইল তাহারা এক বৃক্ষের ছায়ায় নিদ্রামগ্ন। পাছে বালকগণ তাহাদের ডাকে এইজন্য লাহিড়ী মহাশয় ছাত্রদিগকে নিষেধ করিলেন। একজন বালক বলিল "কেন ডাকব না, আপনি দাঁড়াইয়া থাকিবেন আর ওরা ঘুমুবে?" রামতনু যেন অন্তরে ব্যথা পাইলেন, বলিলেন "কর কি কর কি? এমন কাজ করতে আছে? ওরা কত পরিশ্রম করে একটু ঘুমিয়েছে, থাক না। আমি ততক্ষণ তোমাদের সঙ্গে একটু গল্প করি।" কিছুক্ষণ পরে নিদ্রোত্থিত বাহকগণ তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপ্রতিভ হইল এবং তাড়াতাড়ি সব ঠিক করিয়া লইল। কঠোর তাড়না অপেক্ষা দয়ার শাসন যে কত অধিক কার্যাকরী তাহা লাহিড়ী মহাশয় বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন।

আর একদিন আতা খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে একটি বালক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আতা কিনিয়া আনিতে প্রস্তুত হইয়া বলিল "আমি কিনিয়া আনিতেছি। আপনি কিনিতে গেলে ঠকিয়া আসিবেন।" রামতনু বাবু তাহাকে বলিলেন "আমি আনিতেছি, তুমি তাহাকে

ঠকাইয়া বেশী আনিবে।” তিনি একপয়সায় দুটী আতা কিনিয়া আনাতে সকলে হাসিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া বলিলেন “আমি কাহাকেও ঠকাইয়া বা অন্যায়রূপে এক কপর্দ্দকও লইতে ভালবাসি না।” তাঁহার পিতার ন্যায় তিনিও ন্যায্য প্রাপ্যের বেশী লওয়া অন্যায় বিবেচনা করিতেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ছাত্রেরা তাঁহার কথা উঠিলে বলিত “অমন খাঁটী মানুষ আর দেখিলাম না। অমন মানুষ কি আর হয় ?”

একদিন তিনি স্কুলে পড়াইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার নিকট খবর আসিল যে তাঁহার ছোট ছেলেটীর আঘাত লাগিয়াছে। একে তিনি ছোট ছেলেটীকে খুব ভালবাসিতেন তাহার উপর একমনে ছাত্রদিগকে পড়াইতেছিলেন। হঠাৎ বাধা উপস্থিত হওয়ায় তিনি বিরক্ত হইয়া বাটী চলিয়া গেলেন। সেখানে শুনিলেন যে, চাকর ছেলেটীকে লইয়া খেলা করিতেছিল। হঠাৎ অসাবধানে পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইয়াছে। গৃহিণী তাহাকে কোলে করিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আরও জোরে জোরে কাঁদিতেছে। তাহা দেখিয়া রামতনু চাকরকে বলিলেন “বাপু তুমি অন্য কোথাও কাজের চেষ্টা দেখ। তুমি যদিও ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়া দাও নাই, তথাপি উহার কষ্ট দেখিলে আর স্থির থাকা যায় না। এরূপ অসাবধান হওয়া অন্যায়। তোমাকে দেখিলেই ছেলের কষ্টের কথা মনে হয় এবং মন খারাপ হয়।” চাকর এই কথা শুনিয়া আর কি বলিবে। রামতনু যদি তাহাকে কড়া কথা বলিতেন তাহা হইলে সে উত্তর দিতে পারিত। মুখে যেরূপ বলিবেন কাজেও ঠিক সেইরূপ করিবেন ইহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি যাহা বলিতেন বা বিশ্বাস করিতেন তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নশীল হইতেন। তাঁহার বাৎসরিক মাতৃশ্রাদ্ধের সময় একটি বালক দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল “এদিকে ত বেশ বলা হয় আমরা কিছু

মানি না, ওদিকে শ্রাদ্ধ করতে বসা হয়েছে, পৈতাটীও বেশ ঝুলচে।” বালক কথা বলিয়া চলিয়া গেল কিন্তু বালকের বিদ্রূপ তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিয়া বহু অশান্তির কারণ হইল। এই কারণে তাঁহার মনে উপবীত রাখিবেন কি না এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়। ইহার সহিত আর একটি গল্পও প্রচলিত আছে। একবার পূজার ছুটীতে তিনি বন্ধুদের সহিত নৌকাযোগে বেড়াইতে যাইতেছিলেন। পথে মাঝিদের প্রস্তুত আহার্য্যই খাওয়া চলিতেছিল। সহচরদিগের মধ্যে একজন কৌতুক করিয়া বলিলেন “আমরা মুসলমান মাঝিদের হাতে খাইতেছি আবার পৈতাও রাখিয়াছি। রামতনু বাবুর হৃদয়ে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন তবে আমরা খাঁটি হইয়া কাজ করিতেছি না। এদিকে নব্যতন্ত্রের উপাসক হইয়াও আমরা প্রাচীন কুসংস্কার এখনও ছাড়ি নাই। এই একটি কৌতুকে ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তিনি চিরদিনের মত উপবীত ত্যাগ করিলেন। সমাজ তাঁহার এই কার্য্যে কিরূপ মতামত প্রকাশ করিবে বা আত্মীয় স্বজনেরাই বা কি বলিবেন ইহা ভাবিবার তাঁহার অবসর হইল না। দ্বৈধভাবাপন্ন হওয়ায় যে মানসিক অশান্তি হইয়াছিল তাহা দূর করিবার জন্যই তিনি উপবীত ত্যাগ করিলেন। তিনি যখন বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিলেন তখন কি কষ্টই না সহ্য করিতে হইয়াছিল। কোন চাকর তাঁহার কাজ করিতে চাহিল না। সকলেই ছাড়িয়া গেল। তিনি যেন কতই অন্যায় কাজ করিয়াছেন সকলে এরূপ ভাবিতে লাগিল। কুলীন সন্তান বলিয়া অল্পবয়সেই তাঁহার বিবাহ হয়। সেই পত্নী মারা যাওয়ায় তিনি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহারও মৃত্যু হইলে হাবড়া জেলার সাঁতরাগাছি গ্রামনিবাসী কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা গঙ্গামণি দেবীকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি নিতান্ত অল্পবয়স্কা। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নবকুমারও শিশু। বালকের রক্ষণাবেক্ষণ এবং গৃহস্থালীর কার্য্য লোকাভাববশতঃ তাঁহাকেই করিতে হইত। এত কষ্টে পতিত হইয়াও

লাহিড়ী মহাশয় কখন কাতর হন নাই। বরং তাঁহার পত্নী পাড়ার দশজনের কথায় ব্যথিত হইলে তিনি তাঁহাকে মিষ্টকথায় সান্ত্বনা দিতেন। তিনি পৈতা ফেলিয়া দিয়াছেন এই খবর ক্রমে কৃষ্ণনগরে পৌঁছিল। সমাজের লোকগণ দল বাঁধিয়া তাহার জন্য নির্য্যাতন করিতে উদ্যত হইলেন। লাহিড়ী মহাশয় বর্দ্ধমানে ছিলেন, কাজেই তাঁহাকে হাতের নিকট না পাইয়া তাঁহার পিতা রামকৃষ্ণের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। রামকৃষ্ণ স্বভাবতঃ ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া সমস্ত কষ্ট নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন। পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের চৈত্রমাসে ইষ্টদেবতার নাম গ্রহণ করিতে করিতে ইনি প্রাণত্যাগ করেন।

এক বৎসর পরে লাহিড়ী মহাশয় উত্তরপাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়া সেখানে চলিয়া আসিলেন। এইখানে আসার পর তাঁহার সামাজিক কষ্ট কিছু পরিমাণে কমিল। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বলিয়া তাঁহার অনেক বন্ধু-বান্ধব, কখনও বা চাকর, কখনও বা রাঁধিবার লোক জোগাইয়া দিতে লাগিলেন। বাঙ্গলার বালকগণের চিরপরিচিত বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সময়ে তাঁহাকে দ্রব্যসামগ্রী প্রভৃতি যখন যাহা দরকার হইত তাহা দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে অনেকে এই সকল অসুবিধা ভোগ করিতে দেখিয়া পুনরায় পৈতা গ্রহণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় কিছুতেই তাহা করিতে স্বীকার করিলেন না। বলিতেন "তখন যখন ভাল বিবেচনায় পৈতা ফেলিয়া দিয়াছি এখন আর তাহা ফিরিয়া লইব না। যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে। আমার মত আর বদলাইতে পারিব না।" এই সময়ে লীলাবতী ও ইন্দুমতী নামে তাঁহার দুইটা কন্যা হয়।

উত্তরপাড়া অবস্থানকালে তিনি যে সরল চিত্তের পরিচয় দিয়াছেন তাহা ইতর, ভদ্র কেহ কখন ভুলিতে পারিবে না। কলিকাতা হইতে মাঝে মাঝে তাঁহার বন্ধুগণ উত্তরপাড়ায় কোন কাজকর্ম্ম করিবার জন্য

বা বেড়াইতে আসিলে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন। একদিন তাঁহারা লাহিড়ী মহাশয়ের বাসায় আসিয়া দেখিলেন তিনি বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা গঙ্গার ধারে বেড়াইতে যাইতেছেন, সন্ধ্যা হইয়াছে এমন সময় দেখিতে পাইলেন লাহিড়ী মহাশয় ফিরিতেছেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি গঙ্গার ধারে কি জন্য বেড়াইতে গিয়াছিলেন।" তিনি বলিলেন "সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ধারে বেশ ফুরফুরে হাওয়া বয়, তা ছাড়া মাঝিদের সরল আচার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের সঙ্গে তাহাদের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম।" এই সাধাসিধে কথা শুনিয়া বন্ধুরা সকলেই মুগ্ধ হইলেন।

যে সময় সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয় তখন রামতনু বাবু বারাসতে ছিলেন। এইখানে অবস্থানকালে তাঁহার পুত্র শরৎকুমারের জন্ম হয়। দেড় বৎসর পরে তিনি কয়েক মাসের জন্য কৃষ্ণনগরে যান। সেখান হইতে কলিকাতার দক্ষিণবর্ত্তী রসাপাগলা নামক স্থানে টিপুসুলতান বংশীয়দিগের শিক্ষা দিবার জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়ে তিনি বদলী হইলেন। তিনি প্রথম শ্রেণীতে ভূগোল ও ইতিহাস পড়াইতেন। আজকাল ছেলেরা ইতিহাস বিশেষতঃ ভূগোলের কথা শুনিলেই ভয় পায়। কিন্তু রামতনু বাবুর পড়াইবার এমন এক সুন্দর পদ্ধতি ছিল যে এরূপ কঠিন বিষয়ও ছাত্রেরা সহজে বুঝিতে পারিত।

১৮৬০ খৃঃ অব্দে তিনি তিন মাসের জন্য বরিশালে গমন করিলেন। অতি অল্পকালের জন্য সেখানে থাকিলেও তিনি ছাত্রগণের মনে তাঁহার স্মৃতি রাখিয়া আসিয়াছেন। প্রত্যহ বিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ ঘাটের উপর বসিয়া কথোপকথনচ্ছলে নানা তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। শিক্ষাদিবার পদ্ধতি এবং সস্নেহ ব্যবহার ছাত্রদিগকে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত করিয়াছিল। শিক্ষা দিবার সময়ে পবিত্রতা, সত্যনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতি এমন সুন্দর ছিল যে তাহা আর বলিবার নহে। তিনি কখনও ছাত্রদের তিরস্কার করিতেন না। এইজন্য অনেক ছাত্র তাঁহাকে আরও বেশী ভয় করিত। ইতিহাস এবং ভূগোল প্রায়ই অনেকে মুখস্থ করিয়া থাকে। পাছে ছাত্রেরা মুখস্থ করিয়াও লিখিবার সময় ভুল লিখে এইজন্য তিনি তাহাদের খাতায় লিখিবার অভ্যাস করাইতেন। দু'একটি ছাত্র কিছু না লিখিতে পারিলে বা ভুল লিখিলে তিনি তাহাকে প্রথম বা দ্বিতীয় দিন কিছু বলিতেন না। পরে যদি পুনরায় একই রকম ভুল হইত তাহা হইলে তিনি আর তাহার খাতা দেখিতেন না। সরলপ্রকৃতি এবং ক্রোধশূন্য শিক্ষকের এই প্রত্যাখ্যানে ছাত্রেরা মনে, বড়ই কষ্ট অনুভব করিত। পরে সেই ছাত্রই আবার দ্বিগুণ উদ্যমে নিজ পাঠ অভ্যাস করিয়া শিক্ষকের মনস্তুষ্টি করিতে চেষ্টা করিত। তখন রামতনু বাবু আবার সেই বালককে দৃষ্টান্ত স্বরূপে দেখাইয়া অপর ছাত্রগণকে বলিতেন "তোমাদের মনঃসংজ্ঞকে উত্তেজিত কর, তাহা হইলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।" এইরূপে সুশিক্ষার সহিত নীতিবীজ বপন করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

৩২ বৎসর কাজ করিবার পর বায়ান্ন বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণের জন্য তিনি আবেদন করিলেন। সেই সময়ে মিঃ আলফ্রেড স্মিথ তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি আবেদনপত্র পাঠ করিয়া তাহা ডিরেক্টর বাহাদুরের নিকট পাঠাইবার সময় লিখিয়া দিলেন—রামতনু বাবুর ন্যায় কর্ত্তব্যকর্ম্মসম্পাদনে যত্নবান খুব কম লোককেই দেখা যায়। উৎসাহ এবং একাগ্রতার সহিত নীতি শিক্ষা দিবার জন্য কেহই তাঁহার ন্যায় প্রয়াস করেন নাই।

রামতনু বাবুর কৃতীছাত্র ক্ষেত্রমোহন বসু তাঁহার শিক্ষা দিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ আমাদের জানা দরকার। তিনি বলেন—

"তিনি প্রত্যেক ছাত্রের নাম, বাড়ী, অভিভাবক কে, তাঁহার অবস্থা কেমন এ সকল সমাচার অনুসন্ধান করিয়া জানিতেন।

আহারের পরই মানসিক চিন্তা অস্বাস্থ্যকর এই জন্য স্কুল আরম্ভ হইলেই প্রথমে লিখিবার পদ্ধতি করিয়াছিলেন। আধ ঘণ্টা লেখার পর পড়া আরম্ভ হইত। পড়ার প্রথম অঙ্গ আবৃত্তি।

যতক্ষণ না উচ্চারণশুদ্ধি ও যতিচ্ছেদ ঠিক হইত ততক্ষণ আবৃত্তি করিয়া শিখাইতে তিনি ত্রুটী করিতেন না। পাঠের অনেক অংশ তাঁহার আবৃত্তি গুণে সহজে বোধগম্য হইত। আবৃত্তির পর ব্যাখ্যা আরম্ভ হইত। শব্দের প্রতিশব্দ বলিলেই অর্থ হয় না। প্রথমে সহজ ভাষায় অর্থ বলা হইত। তারপর প্রশ্ন দ্বারা লেখকের ভাব ছাত্রদের বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। অপর বিষয় কিছু বলিবার থাকিলে পরে আলোচনা করা হইত।

ছাত্রেরা বুঝিতে পারুক বা না পারুক জোর করিয়া শিখাইতে হইবে ইহা তিনি ভালবাসিতেন না। ছাত্রেরা যাহাতে আপনারাই শিখিবার জন্য চেষ্টা করে এবং যাহাতে শিক্ষার ফল তাহারা কার্য্যে পরিণত করে এই সকল বিষয়ে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। পাঠ্য পুস্তকের অতিরিক্ত বায়রণ, কাউপার, টমসন, বারণস্ প্রভৃতি কবিগণের কবিতা বাছাই করিয়া পড়িতেন। ছাত্রেরা যাহাতে ইংরাজী সাহিত্যের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে সে বিষয়ে তিনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন।

রামতনু বাবুর শিক্ষকতা কার্য্যে সফলতার আর একটি কারণ ছিল। ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। তিনি চির জীবনই ছাত্র ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও কাহারও নিকট কোন একটি নূতন তথ্য শুনিলে তাহা সযত্নে ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন।

উচ্চারণশুদ্ধির প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সামান্য ব্যতিক্রমও তিনি ধরিতে পারিতেন। প্রথমে তিনি ছাত্রদের মনে কৌতূহল

জন্মাইবার চেষ্টা করিতেন। সেই সঙ্গে নানা কথা বলিয়া সমস্ত বিষয়টা তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন। তাহারা জিজ্ঞাসু হইলে তাহাদের মুখ হইতেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া দরকারী বিষয় বাহির করিবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপে পাঠ্যগ্রন্থের উন্নতি খুব কম হইলেও যাহা পড়া হইত তাহাতে সকলেই ব্যুৎপত্তি লাভ করিত।

শরীররক্ষা বিষয়েও তিনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি নিজেই তাহাদের সহিত ব্যায়াম করিতেন। এই জন্যই শেষ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার শরীর সবল ছিল।

তিনি যে সময় বরিশালে অবস্থান করেন তখন সেখানে খুব ম্যালেরিয়া হইতেছিল। লাহিড়ী মহাশয় ঐ রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। অবসর গ্রহণের পর বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য তিনি ভাগলপুর গমন করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট অংশ কিছু দিন কৃষ্ণনগরে ও কিছু দিন কলিকাতায় থাকিয়া কাটাইয়া দিলেন। পেন্‌সন্ গ্রহণের পরও তিনি ৩২ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ জীবনের একমাত্র কারণ এই যে তিনি সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতেই নিয়মিতভাবে কার্য্য করিতেন। সকল সময়েই তিনি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃ ভ্রমণে বাহির হইতেন। পাখীদিগের প্রভাতী সঙ্গীত ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে লাল আভায় চিত্রিত আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘগুলির অপূর্ব্ব শোভা তাঁহাকে বিশেষ আনন্দিত করিত।

সহপাঠী ও বন্ধুদিগের প্রতি লাহিড়ী মহাশয়ের শ্রদ্ধা, ভক্তির অবধি ছিল না। তাঁহার উত্তরপাড়া অবস্থানকালে কোন এক ব্যক্তি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক পত্র লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। পত্র দেখিবামাত্র তিনি তাহা মাথার উপরে রাখিয়া বলিলেন, "আমার গুরুর পত্র", পরে তাহা পাঠ করিলেন।

তাঁহার সরলতা ও অপার স্নেহের গুণে সকল ছাত্রই তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত।

চাকরী হইতে পেন্‌সন্ গ্রহণের পর তাঁহার পুরাতন ছাত্রদের মধ্যে অনেকে সকল সময় তাঁহাকে অকুণ্ঠিতচিত্তে অর্থ বা শারীরিক পরিশ্রম দিয়া পুত্রাধিক সাহায্য এবং সেবা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পুত্র নবকুমারের যক্ষ্মারোগ হইলে রামগোপাল ঘোষের বাসায় থাকিয়াই তাঁহার চিকিৎসা চলিতে থাকে। পরে নবকুমার আরোগ্য না হওয়াতে ইনিই চেষ্টা করিয়া এবং অর্থ সাহায্য করিয়া তাঁহাকে নানাস্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য পাঠান। লাহিড়ী মহাশয়ের অপর পুত্র শরৎকুমার প্রথমে কেরাণীগিরি কার্য্য করিতে থাকেন। কিন্তু তাহা সুবিধাজনক নহে বুঝিয়া চাকরী ছাড়িয়া দেন এবং স্বাধীনভাবে বই বিক্রয়ের কার্য্য আরম্ভ করেন। প্যারীমোহন বাবু এই সময়ে যে পরিমাণে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন তাহা না করিলে তিনি কখনই ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারিতেন না।

তাঁহার সাধুতার গুণে শুধু যে নিজ পরিচিত আত্মীয় বন্ধুগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন কি ইতর কি ভদ্র সকলেই তাঁহাকে সমান ভাবে শ্রদ্ধা করিত। এক সময় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কৃষ্ণনগরের পাশের কোন গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে কি এক কৌতূহল উপস্থিত হইল। তিনি কিছুদূর গিয়া দেখিতে পাইলেন জনকয়েক কৃষক লাঙ্গল কাঁধে করিয়া আসিতেছে। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলেন। পরে তাহারা কাছে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কি কৃষ্ণনগরের লোক?" উত্তর হইল "আজ্ঞে হাঁ, কৃষ্ণনগরেরই বলিতে হইবে, এই পাশের গ্রামের।"

শাস্ত্রী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা রামতনু লাহিড়ীকে চেন?"

তাহারা বলিল—"তাঁকে কে না চেনে?"

পুনরায় প্রশ্ন হইল—"তিনি কেমন মানুষ?"

উত্তর হইল—"তাঁর কথা কি আর বল্‌তে হয় মহাশয়! তিনি কি মানুষ? তিনি দেবতা।

প্রশ্ন হইল—"সে কি হে! পৈতা ফেলা লোক, হাঁস মুরগী খান, দেবতা কি রকম।"

অমনি তাহারা ফিরিয়া দাঁড়াইল—"কে গো মশাই, আপনি বোধ হয় এদেশের লোক নন।"

"না বাপু, আমি এদেশের লোক নই।"

উত্তর "ওঃ তাইতে, আপনি যে সব বল্লেন ও সব অন্যের পক্ষে করা অন্যায়, ওঁর পক্ষে দোষ নয়, উনি যা করেন তাই শোভা পায়।"

বলা বাহুল্য যে আত্মীয় বন্ধুগণের সুখ্যাতি হইতে সামান্য কৃষকের এই মতের মূল্য অনেক বেশী। ভাগ্যবান্ রামতনু যেখানেই গিয়াছেন সেইখানেই এই সুখ্যাতি পাইয়াছেন।

রামতনু কিরূপ সরলচেতা লোক ছিলেন তাহা একটি ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যাইবে। একদিন তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, সকলেই গহনা পরিয়া বেড়ায়, আমার কিছুই নাই। কাহারও বাড়ীতে যেতে হ'লে খালি গায়ে যাওয়া যায় না, পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে। আমাকে এক জোড়া বালা গড়াইয়া দাও।" রামতনু দেখিলেন কথাটা ঠিক। পরদিনই গহনার ফরমায়েস হইয়া গেল। সপ্তাহকাল পরে তাঁহার বন্ধু রামগোপাল বালা আনিয়া দিলে তিনি তাহার গৃহিণীকে দিলেন। তিনি তাহা মহা আনন্দের সহিত পরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দুইদিন পরে পাড়ার স্ত্রীলোকেরা বালার মধ্যে কোন গোলমাল আছে সন্দেহ করিয়া তাহা গিল্টি করা বলাতে তিনি তাহা স্বামীকে জানাইলেন, রামতনু তাহা কাণেই তুলিলেন না। বলিলেন "রামগোপাল দিয়াছেন,

উহা কি পিতলের হইতে পারে।” পরম বন্ধু রামগোপাল হাতে করিয়া দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে কোন সন্দেহ স্থান পাইল না। পুনরায় পাড়ার স্ত্রীলোকদের কথা রামতনু বাবু তাঁহার স্ত্রীর নিকট শুনিয়া নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত রামগোপালকে ঐ কথা বলিলেন। তিনিও কৌতুক এতদিনে ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ সোণার বালা আনা হইল এবং লাহিড়ী মহাশয় তাহা স্ত্রীকে দিলেন।

নিতান্ত সরল প্রকৃতির এবং শান্ত স্বভাবের হইলেও রামতনুবাবুর যথেষ্ট আত্মসম্মানজ্ঞান ছিল। বিদেশে অবস্থানকালে তিনি কোন এক কাজের জন্য একজন উচ্চপদের সাহেবের বাড়ী গিয়াছিলেন। সেইখানে কথায় কথায় ক্রমে হিন্দুজাতি সম্বন্ধে কথা উঠিলে, উক্ত সাহেবের একজন বন্ধু বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে নিন্দাজনক দু'একটি কথা বলেন। লাহিড়ী মহাশয় বিনাকারণে এই নিন্দা শুনিয়া সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনিও ঐ সাহেবকে রাগিয়া দু চারি কথা শুনাইয়া দেন। পরে উচ্চপদস্থ সাহেবটী দুজনকে বুঝাইয়া বিবাদ মিটাইয়া দেন।

এই ব্যাপারের বহুদিন পরে রামতনু বাবু একদিন রাস্তা দিয়া যাইতে ছিলেন, এমন সময় একটি সাহেব আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল “কি মহাশয়, আমায় চিনিতে পারেন।” অনেক দিন আগের দেখা শুনা কাজেই লাহিড়ী মহাশয় প্রথমে চিনিতে পারিলেন না। পরে সাহেবটী পরিচয় দিলে তিনি চিনিতে পারিলেন যে, ইনিই পূর্ব্বে তাঁহার নিকট নিন্দা করিয়াছিলেন। তখন উভয়ে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া আলাপ পরিচয় হইল। অনেক পুরাতন দিনের কথাবার্ত্তা হইবার পর উভয়ে বন্ধুভাবে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। রামতনু বাবু সাহেবটীর ব্যবহারে খুব আপ্যায়িত হইলেন।

তিনি অত্যন্ত সত্যপ্রিয় লোক ছিলেন, যাহা কাজে করিব তাহা

অপরের কাছহইতে লুকাইয়া রাখিব ইহা তিনি ভালবাসিতেন না। আবার তিনি যাহা ভালবাসিতেন না তাহা স্পষ্টই বলিতেন, লোকে নিন্দা করিবে এই ভয়ে তাহা কখন লুকাইয়া রাখিতেন না। এক সময়ে তাঁহার একটি বন্ধুর বাটীতে বসিয়া গল্প হইতেছে, এমন সময় চাকর তাঁহার বন্ধুর নিকট হুঁকা সাজিয়া লইয়া আসিল। বন্ধু বয়সে ছোট ছিলেন এবং লাহিড়ী মহাশয়কে বিশেষ ভক্তি করিতেন। সেই জন্য তিনি চাকরকে তামাক লইয়া যাইবার জন্য ইসারা করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "আমাকে দেখে ওটা লুকালে কেন? যদি ভাল বুঝ তবে সাক্ষাতে খাও। আর যদি তা না হয় তবে একেবারে ছাড়িয়া দাও। লুকানর দরকার কি?"

ভগবানের নামকীর্ত্তন শুনিলে ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিত, তিনি অনেক সময় কাঁদিয়া ফেলিতেন। তিনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গোবরডাঙ্গার জমীদার বাবুদের নাবালক পুত্রের অভিভাবক হইয়া সেখানে গমন করিলেন। তাঁহার আহ্বানে যাঁহারা কখন উপাসনায় যোগ দেন নাই এমন অনেক লোকও তাঁহার সহিত উপাসনা করিতে আসিতেন।

তিনি নিজে কোনরূপ বিচার না করিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে সকলের সহিত মিশিতেন। তিনি যে কোন দলাদলি ভালবাসিতেন না তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিবার সময় দলাদলি বা অভিমান ত্যাগ করা উচিত ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি বলিতেন "পবিত্র নামোচ্চারণের পূর্ব্বেই পবিত্রতা সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে হইবে। ঈশ্বরের নাম বৃথা লইও না।" এই উপদেশ তিনি এরূপভাবে পালন করিতেন যে, যখন তখন ঈশ্বরের নাম শুনিতে চাহিতেন না। এক-সময় কোন একজন সুগায়ককে একটি গান করিতে বলিবামাত্রই তিনি গুণ্ গুণ্ সুর আরম্ভ করিলেন। রামতনু বাবু তখন চা খাইতেছিলেন। তিনি মহা অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিলেন "মশাই একটু অপেক্ষা করুন।

আমি এখন নাম শুনিবার অবস্থাতে নাই।" এই বলিয়া তিনি গললগ্নী-কৃতবাসে উপবেশন করিয়া বলিলেন "এখন গান করুন।"

একদিন তিনি একটি বন্ধুর সহিত গঙ্গার ধার হইতে বেড়াইয়া ফিরিবার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "একজন সাধুপুরুষকে দেখে আজকার দিনটা সার্থক করিবে?" বন্ধু বলিলেন "এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি আছে।" পরে উভয়ে একটি পাদরীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এরূপভাবে আলিঙ্গন করিলেন ও শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রদর্শন করিলেন যে তাহা দেখিয়া তাঁহার বন্ধু একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি নিজে যেমন সাধু ছিলেন, অকৃত্রিম সাধুতা দেখিলে অকপটে সেইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তিও দেখাইতেন। কিন্তু অসাধুতা তিনি মোটেই দেখিতে পারিতেন না। অনেক সময় শাক বা তরিতরকারী বিক্রয়কারিণীরা তাঁহার বাটীতে গৃহিণীর নিকট বিক্রয় করিতে যাইত। রামতনু বাবু তাহাদের মধ্যে দু একজনকে খারাপ লোক বলিয়া জানিতেন, সেই জন্য তিনি প্রায়ই তাহাদের আসিতে বারণ করিয়া দিতেন। গৃহিণী বলিতেন "ওরা খারাপ তাতে কি হয়েছে, আমিত খালি ওর কাছে কিনিব বইত নয়"? রামতনু তাহাতে উত্তর দিতেন "ওরূপ খারাপ লোকের সহিত কোন সংস্পর্শ রাখা উচিত নয়।" পরিচারিকারা প্রায়ই ছোট ছেলে কাঁদিলে বলিত "চুপ কর সন্দেশ আনিয়া দিব।" রামতনু একদিন ঐ কথা শুনিয়া তাহাকে বলি-লেন "সন্দেশ দিব যখন বলিয়াছ তখন এখনই আনিয়া দিতে হইবে। তাহা না হইলে মিথ্যা কথা হইবে। এইরূপেই ছেলেরা মিথ্যা শিখিয়া থাকে।" এইরূপে মুখে একরূপ ভাব মনে অন্যরূপ ইহা তিনি দেখিতে পারিতেন না। যথার্থ সাধুলোক দেখিলে জাতিবিচার করিতেন না। তাঁহার কাছে হিন্দু মুসলমান বিচার ছিল না, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁহার বন্ধু ছিল। সকল শ্রেণীর লোককেই তিনি ভালবাসিতেন; ইহাই তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে তাঁহার তৃতীয় পুত্র বিনয়কুমারের জন্ম হয়। ইহার কিছুদিন পরেই জনকয়েক ব্রাহ্ম, স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ের আন্দোলন করেন। রামতনু বাবু মেয়েদের লেখাপড়া শেখান ভালবাসিতেন। তাহারা যে মূর্খ হইয়া থাকিবে ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না। মেয়েদের জন্য প্রথম স্কুল হইলেই রামতনু নিজ কন্যা ইন্দুমতীকে তাহাতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

এইরূপে নিশ্চিন্তে অধিক দিন বাস করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। সূর্য্য উঠিলে তাহা পুনরায় অস্তগিয়া থাকে, আলোকের পর অন্ধকার হয়, এগুলি যেমন স্বাভাবিক নিয়ম, সেইরূপ মানুষের জীবনেও সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ হইয়া থাকে। রামতনু বাবুর জীবনে যদিও প্রকৃতপক্ষে সুখ ভোগ করা খুব কম দেখিয়াছি, তথাপি তিনি যে শান্তিতে বাস করিতেছিলেন ইহা বলিলে কোন ভুল হইবে না। এখন হইতে দুঃখের পালা আসিল। তাঁহার পুত্র নবকুমার এই সময়ে মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। ছেলেদের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরীক্ষা নিকট হইলেই তাহারা খুব বেশী পরিশ্রম করিয়া থাকে। তাহারা বুঝে না যে প্রত্যহ নিয়ম করিয়া পরিশ্রম করিয়া, শরীরকে কিছু-ক্ষণের জন্য বিশ্রাম দেওয়া দরকার। মানুষের শরীরও যন্ত্রবিশেষের ন্যায়। উপযুক্ত বিশ্রাম এবং সময়মত আহার বিহারের অভাবে যে কার্য্যকরী শক্তি নষ্ট হয় ইহা নবকুমার ভুলিয়া গিয়া পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ফলে তিনি রোগে আক্রান্ত হইলেন। ক্রমে তাহা যক্ষ্মা রোগে দাঁড়াইল। লাহিড়ী মহাশয়কে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে কলিকাতায় আসিতে হইল। কলিকাতায় রোগের উপশম না হওয়ায় তাঁহাকে ভাগলপুর পাঠান হইল। কিছুদিন সেখানে থাকিবার পর নবকুমার একটু আরাম হইলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের প্রাণে আশার সঞ্চার হইল।

চলিত কথায় বলে বিপদ কখন একাকী আসে না। এই

সময়কার লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের ইতিহাসও ঠিক সেইরূপ। একেত তিনি পুত্রের অসুস্থতায় বিশেষ চিন্তান্বিত। তদুপরি তিনি সংবাদ পাইলেন তাঁহার জামাতা কি কারণে জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। লাহিড়ী পরিবার একেবারে শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাঁহার বিধবা কন্যা লীলাবতী ছয় বৎসরের পুত্রকে লইয়া পিতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন ভাল থাকিবার পর নবকুমারের পীড়া পুনরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। লাহিড়ী মহাশয়ের কন্যা ইন্দুমতী প্রাণপণে ভ্রাতার সেবা করিতে লাগিলেন। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র রোগীর পার্শ্বে বসিয়া থাকার জন্য তাঁহারও শরীর খারাপ হইতে লাগিল, দু'চার দিন পরে দেখা গেল তাঁহারও যক্ষ্মারোগ হইয়াছে। এদিকে নবকুমারের অসুখ কিছুমাত্র আরোগ্য হইল না। লাহিড়ী মহাশয় যেন পাগলের মত হইয়া গেলেন ; কি যে করিবেন তাহা কিছু ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার বন্ধুরা এই সময়ে চেষ্টা করিয়া রোগীদিগকে আরায় পাঠাইলেন। সেখানে গিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যার খুব প্রবল জ্বর হইল এবং কয়েকদিন পরে পিতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। ইন্দুমতীর জীবনেরও কোন আশা রহিল না, তিনিও তাহার পরেই মারা গেলেন। ভগিনীর মৃত্যুতে নবকুমার বিশেষ আঘাত পাইলেন। তাঁহার সেবা করিতে গিয়া ভগিনী রোগাক্রান্ত হইয়া মারা গিয়াছেন, ইহা অনবরত তাঁহার মনে হওয়াতে তিনিও জীবনে হতাশ হইলেন। পিতামাতার সমস্ত চেষ্টা বিফল করিয়া ১৮১৮ খৃঃ অব্দে তাঁহারও মৃত্যু হইল।

লাহিড়ী মহাশয়ের এই সময়ের অবস্থা আলোচনা করিলে বড় বিস্মিত হইতে হয়। তিনি একবারও কাঁদিলেন না। এতগুলি প্রিয়তম পুত্র কন্যার মৃত্যুতেও তিনি বিচলিত হইলেন না। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার

ন্যায় ধীরভাবে কে শোক সহ্য করিতে পারে? শুধু তাহাই নহে, গৃহিণী শোকে কাতর হইয়া কাঁদিলে "তিনি তাঁকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেন "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে তিনি উহাদের যন্ত্রণার হাত হইতে উদ্ধার করিয়া নিজের মঙ্গলময় ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছেন।" এই সময় কোন এক বন্ধুকে পত্র লিখিবার সময় তিনি বলিলেন "তুমি শুনিলে সুখী হইবে ইন্দুমতীর রোগের উপশম হইয়াছে।" কি ধীরতা! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনিই আবার কাহারও সামান্য ক্লেশ দেখিলে দুঃখে অভিভূত হইতেন। তাঁহার এই স্থির, সৌম্য ভাব দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি বলিতেছেন—

"ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়"।

বাহিরের অবস্থা এরূপ হইলেও ভিতরে যে প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। শত শত গৃহকার্য্যের মধ্যে পুত্র কন্যার দুঃখময় স্মৃতি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। তদুপরি গৃহিণীর করুন ক্রন্দন। অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে হইল। তাঁহার সেই সময়কার আয় মাত্র পেনসনের টাকা কয়টি, তিনি একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না যে এই অল্প আয়ে কি করিয়া খরচ চালাইবেন। এক মাত্র করুণাময় ঈশ্বরের করুণায় নির্ভর করিয়া তিনি চলিয়া আসিলেন। যাহা হউক পুত্রাধিক ছাত্রগণের এবং প্রিয়বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সদাশয়তায় তাহাকে একদিনের জন্যও সাংসারিক অসচ্ছলতার কথা ভাবিতে হইল না। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন যে এতগুলি লোক একান্ত মনে তাঁহার কষ্ট দূর করিবার জন্য চেষ্টিত।

এই সকল বিপদের মধ্যেও তাঁহার পুত্র শরৎকুমার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে লাইব্রেরিয়ানের কাজ গ্রহণ করিতে হইল। পাঁচ বৎসর পরে তিনি স্বাধীন ভাবে

পুস্তকের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। সামান্য অবস্থা হইতেও যে কেবল মাত্র অদম্য উত্তম, অধ্যবসায় ও সততার গুণে জীবনে উন্নতি করা সম্ভবপর তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তরূপে তাঁহার সুবৃহৎ অট্টালিকা ও বহুকর্ম্মচারী পরিচালিত পুস্তকের দোকান দণ্ডায়মান থাকিয়া যেন অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া সকলকে বলিয়া দিতেছে—"কর কর্ম্ম হবে জয়"।

এই সময়ে ব্যবসায়ের উন্নতির সহিত সাংসারিক ক্লেশ কম হইল বটে কিন্তু পুত্রকন্যা-বিয়োগ দুঃখে কাতর গঙ্গামণি দেবী এ সৌভাগ্য অধিক দিন ভোগ করিতে পাইলেন না। নিষ্ঠুরহৃদয় কাল তাঁহার এই সৌভাগ্যোদয়ে হিংসাপরায়ণ হইয়াই যেন তাঁহাকে লইয়া চলিয়া গেল। এই শেষ জীবনে লাহিড়ী মহাশয়কে আরও বেশী শোক পাইতে হইয়াছিল। তাঁহর পুত্রাধিক প্রিয়ছাত্র কালীচরণ—যাঁহার সাহায্য এবং ভরসায় রামতনু বাবু তাঁহার পুত্র কন্যার রীতিমত চিকিৎসা করাইতে পারিয়াছিলেন, যিনি সকল সময়ে পিতার অপেক্ষা অধিক ভক্তির সহিত তাঁহার অসুবিধা দূর করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত থাকিতেন, যিনি লাহিড়ী মহাশয়ের সামান্য রকম কষ্ট দূর করিতে সক্ষম হইলে নিজেকে সুখী মনে করিতেন, সেই পরমবন্ধু কালীচরণ পরোলোক গমন করিলেন। তাহার উপর আবার শুধু লাহিড়ী মহাশয়ের উপকারী নহেন, সমগ্র বাঙ্গলা দেশের দীনদুঃখীর পরম আত্মীয় দয়ার সাগর, বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও মৃত্যু হইল। তাঁহাদের শোক লাহিড়ী মহাশয়কে একেবারে বিচলিত করিল। নিজের প্রিয় পুত্র এবং দুইটী কন্যার শোক তিনি এক রকম সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজ পত্নী এবং সকল দুঃখকষ্টের মধ্যে সহায় এবং পরামর্শদাতা দুই বন্ধুর বিয়োগ তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। হাজার ধৈর্য্যশীল হইলেও মানুষ আর কত সহ্য করিতে পারে? একটি নয়, দুইটী নয়, ছয়টী প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় লোকের মৃত্যু হওয়াতে লাহিড়ী মহাশয়ের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

লাহিড়ী মহাশয় যেন এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে এইবার তাঁহারও শেষ দিন নিকট হইয়া আসিতেছে। একজন ভক্ত কবি গাহিয়াছেন "শেষের সে দিন মন কররে স্মরণ, ভবধাম যবে ছাড়িবে।" তিনি যেন তাহা মনে করিয়া দিবারাত্র ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া কাটাইতে লাগিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমে একদিন তিনি অসাবধানে খাট হইতে পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার পা ভাঙ্গিয়া গেল। অনেক দিন ঔষধ দেওয়া হইল, পা আর কিছুতে সারিল না। ক্রমে মৃত্যুর দিন নিকট হইলে তিনি এক দিন তাঁহার বন্ধুদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা সকলে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের একটি গান গাহিতে বলিলেন। তিনি কথা কয়েকটা উচ্চারণ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার ঠোঁট নড়িল মাত্র, স্বর বাহির হইল না। তাঁহার একজন বন্ধু প্রায়ই রামতনু বাবুকে একটি গান করিতে শুনিতেন। সেই গানটী তিনি বড় ভালবাসিতেন। ইঙ্গিত বুঝিয়া তিনি গাহিতে আরম্ভ করিলেন "মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়।" দেখা গেল যেন লাহিড়ী মহাশয়ও সেই কথা কয়টি উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে ১৩ই আগষ্ট তারিখে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইল। সকলেই বুঝিল দেশের একজন আদর্শ পুরুষ তাহাদের কাছ হইতে বিদায় লইলেন।

এইরূপে অনেক দুঃখ, কষ্ট ভোগের পর রামতনু বাবুর মৃত্যু হইল। সাধারণ হিসাবে আমরা সকলেই বলিয়া থাকি যে সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ হইয়া থাকে। লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন আলোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে তাঁহাকে সকল সময়েই কোন না কোন অভাবের মধ্যে বাস করিতে হইয়াছে। রামতনু বাবুর শেষ জীবনে যে দুঃখের মাত্রা খুব বেশী হইয়াছিল ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। ছেলে বেলায় তাঁহাকে লেখা পড়া প্রভৃতি করিবার জন্য অনেক অসুবিধা এবং অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে ইহাও আমরা দেখিয়াছি,

মধ্য বয়সে নিজে অর্থ রোজগার করিলেও তাঁহাকে নানা রকম সামাজিক নির্য্যাতন পাইতে হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে জীবনের প্রায় কোন অংশেই সুখ ভোগ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

পিতা এবং পিতামহের নিকট হইতে প্রাপ্ত গভীর ধর্ম্মবিশ্বাস বরাবর তাঁহার মধ্যে সমান ভাবে বর্ত্তমান ছিল। গভীর দুঃখ এবং শোকের মধ্যেও এই ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে তিনি কখন বিচলিত হন নাই।

জীবনে অনেক বড় বড় কাজ করিয়া যাওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। অল্প মাহিনার শিক্ষকতা করিয়া তিনি যে কর্ত্তব্য কর্ম্মে ভক্তি, সত্যপ্রিয়তা এবং পরোপকার প্রভৃতি সদ্‌গুণের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়।

দশজনে তাঁহার সুখ্যাতি করুক বা কাহারও কাছে নাম জাহির করা তিনি পছন্দ করিতেন না। তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে অনেকে সভা সমিতি করিতেন; তিনিও যে, তাহাতে যোগ দিতেন না তাহা নহে। কিন্তু কেহ কখনও তাঁহাকে দশ জনের সামনে নাম কিনিবার জন্য বক্তৃতা দিতে দেখে নাই।

ব্রাহ্ম হইলেও তিনি কখন অপর ধর্ম্মের নিন্দা করিতেন না। তাঁহার বন্ধুদের কাহারও ওরূপ দোষ দেখিলে তিনি তাঁহাদের বারণ করিতেন। তিনি বলিতেন "যে, যে ভাবেই ডাকুক না ভগবানের উপর বিশ্বাস থাকিলেই হইল। অপরে যদি ভাবে যে অন্য রকমে ডাকিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে তবে তাহাকে সেই রূপেই ডাকিতে দাও, বাধা দিও না।" ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কখন কোন দোষ দেখিলে তিনি তাহাও শোধরাইবার চেষ্টা করিতেন।

এইরূপ সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করিয়াও লাহিড়ী মহাশয়ের

নাম স্মরণীয় কি জন্য? ইহার এক মাত্র কারণ তিনি চরিত্রবান্ পুরুষ ছিলেন। এই চরিত্রবলেই তিনি আপামরসাধারণ সকলের শ্রদ্ধা এবং ভক্তির পাত্র ছিলেন। কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম এবং নীতি শিক্ষা দেওয়া তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল।

সম্পূর্ণ

তিন-আনা সংস্করণ কল্পতরু গ্রন্থাবলী

১। বিদ্যাসাগর
২। মাইকেল মধুসূদন
৩। বঙ্কিমচন্দ্র
৪। রাজা রামমোহন রায়
৫। কেশবচন্দ্র
৬। ঠাকুর রামকৃষ্ণ
৭। নেপোলিয়ান
৮। রমেশচন্দ্র দত্ত
৯। রামদুলাল সরকার
১০। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
১১। কৃষ্ণদাস পাল
১২। হাজিমহম্মদ মহসীন
১৩। আনন্দমোহন বসু
১৪। জর্জ্জ ওয়াসিংটন
১৫। প্যারীচরণ সরকার
১৬। লর্ড কিচ্‌নার
১৭। বিবেকানন্দ
১৮। ভূদেব
১৯। জেম্‌সেদ্‌জী টাটা
২০। গোখ্‌লে
২১। দ্বিজেন্দ্র লাল
২২। হেমচন্দ্র
২৩। ডেভিড্‌ হেয়ার
২৪। রামতনু লাহিড়ী
২৫। লোকমান্য তিলক
২৬। শিবনাথ শাস্ত্রী
২৭। বিস্‌মার্ক
২৮। গারফিল্ড
২৯। ম্যাটসিনি
৩০। এব্রাহাম লিঙ্কলন

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন
৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ময়মনসিংহ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ।
পাটুয়াটুলী—ঢাকা।